তৃতীয় অধ্যায়

অভিজিৎ সেনের উপন্যাস ও সমকালীন সময়

অভিজিৎ সেন জন্ম ১৯৪৫ সালে ২৮ শে জানুয়ারি পূর্ববঙ্গের অধূনা বাংলাদেশ কেওড়া গ্রামে। তাঁর উপন্যাসগুলি মূলত ষাট সত্তর আশি নব্বইয়ের দশকের বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা। দেশভাগ, বঙ্গবিভাজন, তেভাগা প্রভৃতি সমসাময়িক কালের খন্ডচিত্র তাঁর উপন্যাসে দেখতে পাই। ত্রিশ বছর কংগ্রেসি শাসনের পর বাম আমলের শুরু হয়। কংগ্রেসি আমলের শেষ দিকে, বাম আমলের পত্তন থেকে নিয়ে তার বিস্তার ও কংগ্রেসি ও বাম আমলের সন্ধিক্ষণে গ্রামবাংলার বিশেষত উত্তরবঙ্গের গ্রাম্য, অন্ত্যজ মানুষদের দূরবস্থার চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে। সত্তর আশি নব্বইয়ের দশকে বাংলার ভূমি ও কৃষিসংক্রান্ত বিষয়, অপারেশন বর্গা, রাজনীতি, দূর্নীতি, সাধারণ মানুষের বঞ্চনা, গ্রামীণ প্রান্তিক নিম্নবর্গীয় সমাজের রোজনামচা আমরা তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে লক্ষ্য করে থাকি। অভিজিৎ সেনের উপন্যাস রচনার প্রথম প্রয়াস 'স্ফুলিঙ্গ'। এটি তার অপরিণত হাতের লেখা। অভিজিতের নিজেরই তা ভালো লাগেনি। ১৯৬৯-৭০ সালে তিনি অতিবাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। উত্তর বঙ্গের নকশালপন্থী কৃষক আন্দোলনের সমর্থক হয়েছিলেন। পরে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে সরে আসেন। প্রথম উপন্যাস 'স্ফুলিঙ্গে' যাতে নকশালবাড়ী আন্দোলনের আবেগ লুকায়িত ছিল। কিন্তু উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি তার ভাই মিহিরের কাছ থেকে হারিয়ে যাওয়ায় তিনি স্বস্তিই পেয়েছিলেন। অভিজিৎ সেনের উপন্যাস রচনার দ্বিতীয় প্রয়াস 'জলের মধ্যে মীন'। এই লেখাটিও অপরিণত বলে প্রকাশ করার কথা ভাবেননি। অভিজিৎ সেনের তৃতীয় উপন্যাস 'বর্গক্ষেত্র', 'এক্ষণ' পত্রিকায় ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয়। বাম সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মধ্যে একটি হল 'ভূমি ও ভূমি

সংস্কার' আইন অর্থাৎ 'অপারেশন বর্গা'। এই অপারেশন বর্গার মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষকেরা ভূমি পায়। আধিয়ার বা ভাগচাষিরা জমির অর্ধেক মালিকানা পায়। এভাবে সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী প্রথার শক্তি খর্ব করে কৃষকদের জমি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। আলোচ্য বর্গক্ষেত্র উপন্যাসে আদিবাসি, বর্গা, প্রভুভক্ত ইত্যাদি সরল গ্রাম্য চিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে। 'অপারেশন বর্গা' কার্যকর হওয়ার ভয়ে জমির মালিকেরা আধিয়ারদের উচ্ছেদ করতে চায়। দক্ষিণ কাশিয়ানির দর্শ একর জমির মালিক শচীকান্ত রায় তার আধিয়ার আস্তিকমাল, পরশুরাম মালকের জমি থেকে উৎখাত করতে চায়। আস্তিকমাল চার পুরুষ ধরে শচীকান্তের জমি চাষ করে আসছে। তাদের উভয়ের মধ্যে পারিবারিক ও হার্দিক সম্পর্ক। কিন্তু যখন বর্গারেকর্ড করার সময় ক্যাম্প বসে তখন অফিসারদের সামনে সরলচিত্তে তারা স্বীকার করে আমরা বাবুর চাকর—চারপুরুষ ধরে চাকর তাই লিখে নিন। আর তার ফলে শচীকান্ত রায় বর্গাহীন ভাবে জমির দখল নিজ নামেই রাখে। কিন্তু কিছুদিন বাদেই যখন শচীকান্ত রায় তার জমি রাখাল সরকারের কাছে বিক্রি করে তখনই আসল তথ্য উঠে আসে। জমির মালিক শচীকান্ত রায়ের বিশ্বাসঘাতকতায় বিশাল দৈত্যের মতো শরীর অথচ শিশুর সারল্যে পূর্ণ আস্তিকমালের দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ও প্রাণ ত্যাগ করে। শুধুমাত্র বিশ্বাসঘাতকতার আঘাতে কারও মৃত্যু হতে পারে এ সত্য কথা শুধু ভারতবর্ষের মতো দেশেই হওয়া সম্ভব। পরশুরাম মাল জমির দখল ছাড়তে রাজি হয় না। শেষ পর্যন্ত তারা বিদ্রোহে নামে। ফলে বর্গক্ষেত্র উপন্যাসে সমকালীন যুগের এক বৈপ্লবীক রূপও পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। বিদ্রোহে বিডিও, এসডিও প্রভৃতির সামনে বিপুল বিক্ষোভে পরশুরাম ও তার দলবল ঘোষণা করেন জোতদার এবার আধি পাবে না, সিকিভাগ পাবে। আজ এই প্রস্তাবে জোর সমর্থনে গর্জে ওঠে জনসাধারণ।

অভিজিৎ সেন যখন 'রহুচন্ডালের হাড়' (১৯৮৫) প্রকাশ করেন (রচনা

করেন তারও আগে প্রায় ১৯৮১-৮২ সালে) তখন শুধু বিষয়বস্তুর জন্য নয়, আখ্যান উপস্থাপনের অভিনবত্বের জন্যও উপন্যাসটি নতুন চমক সৃষ্টি করেছিল। ঔপন্যাসিক কখনও আত্মকথার ঢঙে তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলেন, যার মধ্যে বরিশাল ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, দত্তপুকুর, বালুরঘাটের কথা আছে। সমসাময়িক অনেক কথাকারের জীবন ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে অভিজিতের মিল আছে।

> *''ষাটের শেষ এবং সত্তরে প্রথম পর্বের সবথেকে বড় আন্দোলন যাকে আমরা সত্তর দশকের আন্দোলন বলি, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল প্রথম থেকেই। চাকরি এবং ঘর ছেড়ে গ্রামে চলে যাই আমি। এই আন্দোলনের অংশীদার হওয়াতে একটা নির্দিষ্ট সামাজিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আমার অবশ্যই হয়েছিল। আন্দোলনের অগ্রগতি, বিপর্যয় এবং পরাজয়ের স্তরগুলোতে অন্য সবার মতো আমারও উপলব্ধির পরিবর্তন হয়েছে। সত্তর দশকের আন্দোলনে বিপর্যয়, পরাজয় এবং পর্বতপ্রমান ভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও যে পরিবর্তনের চিহ্ন তারা রেখে গেছে ভারতবর্ষের ইতিহাসে তা বিরল। এই আন্দোলন চলাকালীন যথার্থভাবে গ্রামের অন্তরাত্মার সঙ্গে আমার পরিচয়ের সূত্রপাত হয়।''* [১]

'রহুচন্ডালের হাড়' উপন্যাসটি উত্তরবঙ্গের যাযাবর বাজিকরের জীবন সংগ্রামের কাহিনি। সুদূর অতীতকাল থেকে রহুচন্ডালের হাড়কে ঘিরে স্বপ্ন, বিশ্বাস ও আশায় বাজিকরদের নিরলস পথ চলা। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের গ্রাম

সমাজে (বাদা-কিসমৎ) ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি বিভক্ত মানুষজনের ক্রিয়াকলাপ অভিজিৎ সেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ করেছেন। আপাত সরল আখ্যানের মধ্যে জট জটিলতার অভাব নেই। গল্প-গাথা গান-সামাজিক আচার মিলিয়ে মিশ্রশিল্পের বুনট। অভিজিৎ সেন কতটা সচেতন শিল্পী তা তার 'ছায়ার পাখি', 'আঁধার মহিষ', 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' পড়লে বোঝা যায়। গ্রামবাংলার বাইরের পরিবর্তন তিনি যেমন দেখেছেন (বামফ্রন্টের অপারেশন সমাজ সংস্কৃতির অন্তর্বয়ন। আমরা যাকে বিকল্প উপন্যাসের ধারণা বলেছি, অভিজিৎ সেন তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—

> *''আমি লোককথার আখ্যান ও উপন্যাসে নানাভাবে বিন্যস্ত করি। আখ্যানের অংশ, আখ্যানের চরিত্র, গান, ছড়া, মঙ্গলকাব্য তার রহস্যময় বাস্তবতা যা আমাদের প্রকৃত মানুষের চরিত্রকে ধরতে বুঝতে ভীষণভাবে সাহায্য করে, এসবও আমি উপন্যাসে আনি। ..... সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিন্যাসকে বুঝতে সাহিত্য যদি কিছু সাহায্য করে তাহলে লোকজীবন, লোককথা, মিথ, মন্ত্রযান ইত্যাদির সঙ্গে এখন পর্যন্ত ওতপ্রোতভাবে জড়িত মানুষকেই খুঁজতে হবে। ..... আমি এ সব বিষয়ও সেই বিষয় আশ্রিত যোগ্য আঙ্গিকটিকেই আমার কিছু গল্প উপন্যাসে খুঁজতে চেষ্টা করেছি।''* [২]

'রহুচন্ডালের হাড়' শুধু যাযাবরদের জীবন সংগ্রামের কাহিনি নয়। যাযাবরদের প্রায় পাঁচপুরুষ ধরে দেড়শো বছরের পথচলা এবং একটা অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের পথে এগিয়ে চলাকে অভিজিৎ সেন তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। একটা বিস্তৃত অঞ্চলের ওই সময়ের ইতিহাস, সমাজ, ব্যবসা বাণিজ্য, রাষ্ট্র

ইত্যাদি বহু বিষয়কেই সমকালীন সময়ের নিরিখে তুলে এনেছেন। ১৯৭৩-৭৪ সাল নাগাদ অভিজিৎ সেন বছর খানেকের মতো পশ্চিম দিনাজপুরের একটি সমবায় ব্যাঙ্কে চাকরি করেছিলেন। এই চাকরির সুবাদে সেই সময় বালুরঘাট মহকুমার তপন থানার কয়েকটি গ্রামে এই বাজিকরদের সঙ্গে অভিজিৎ সেনের প্রথম দেখা হয়। মাঝখান থেকে কয়েকবছর বাদ দিয়ে ১৯৭৬-৭৭ সাল থেকে ফের বাজিকরদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ হয় তাঁর। বেশ কয়েকবছর এদের কাছ থেকেও দূর থেকে দেখার ফলে একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা ঔপন্যাসিকের লব্ধ হয়। এই লব্ধ অভিজ্ঞতা দিয়েই 'রহুচন্ডালের হাড়' লেখার কাজ শুরু করেন; সম্ভবত ১৯৮০ সালে কোনো এক সময় থেকেই। বালুরঘাটের তপন থানা জেলার সবচাইতে দরিদ্র থানা। প্রায় সব জমিই এক ফসলি। রুক্ষ কাঁকর মেশানো মাটির। মাটির নীচে জল নেই। পানীয় জলের কুয়োও মাঘ ফাল্গুনে শুকিয়ে যায়। প্রচণ্ড খরা প্রবণ এলাকা। অথচ প্রায় পাঁচহাজারের মতো পুকুর রয়েছে এই থানায়। আদিবাসী এবং তপশীলি অধ্যুষিত তপন থানার দরিদ্রতম মানুষদের মধ্যে যাযাবর বাজিকরদের বাস। বাজিকরদের থিতু হবার সেই প্রক্রিয়া অভিজিৎ সেনের মাথায় রূপ পেতে শুরু করে যখন তিনি লক্ষ্য করেন স্থিতি পাওয়ার আশায় বাজিকরের একটি দল যখন মুসলমান হওয়ার সংকল্প নেয়।

অভিজিৎ সেনের প্রথম সাড়া জাগানো উপন্যাস 'রহুচন্ডালের হাড়' ১৯৮৫ তে প্রকাশিত হয়। রহুচন্ডালের আখ্যানের কল্পময় বাস্তবতার বয়ান, উপন্যাসের কয়েকটি বাক্যের পর ঔপন্যাসিক আমাদের এক আলো আঁধারি ধূসর জগতে সূদক্ষ শিল্পীর মতো তুলে ধরেন। তিনি বলেন—

> *"শারিবার যখন বছর বারো বয়স, তখন নানি লুবিনীর সঙ্গে তার সখ্য গভীরতর হয়।... 'লুবিনী*

এক অজ্ঞাত দেশের কথা বলে।''[৩]

'রহুচন্ডালের হাড়'-এর এক প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অভিজিৎ সেন যাদের বাজিকর বলেছেন। পীতেম বাজিকর গোষ্ঠীর দলপতি সে দিক নির্দেশ খোঁজে। যেভাবে গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের, মোকান্দর কুড়িঘর মানুষ নতুন ভূখন্ড আবিষ্কারের স্বপ্ন দেখে। ইন্দো-ইরানীর যাযাবর জনগোষ্ঠী যেভাবে মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে এসেছিল স্থায়ীত্ব পাওয়ার জন্য। পীতেম এমনই এক প্রত্যয়ে বাসযোগ্য ভূমি, আবাদযোগ্য জমি খোঁজার চেষ্টা করে। পূর্বপুরুষ রুহুর সাবধানবানী সত্ত্বেও তার উত্তরপুরুষ সমগ্র উপন্যাসে আশ্রয় খোঁজে। স্বস্তি চায় আর্থসামাজিক রাজনৈতিক স্থিতিতে, সমাজের মূল স্রোতের প্রতিবেশি হয়ে। ঘটনাক্রমে উপন্যাসে আমরা দেখি সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর নেতা লক্ষণের সঙ্গে প্রীতমের একান্ত আলাপ ঘটে—

'লক্ষণ জিজ্ঞেস করে, 'তোমাদের কি জাত সরদার!'
পীতেম বলে, 'আমরা বাজিকর জাত।'
লক্ষণ বলে, 'বাজিকর কোনো জাত নয়।'
পীতেম বলে, 'হিন্দু-মুসলমান সমাজ আমাদের ডোম চন্ডালের জাত হিসাবে ধরে।'

তাদের এই কথোপকথোনে ধর্মভিত্তিক সমাজের স্বর ধরা পড়ে। অর্থাৎ সমাজে উঠতে হলে ধর্ম ও জরুরী।

বস্তুত, রহুচন্ডালের মিথের আবহে উপন্যাসটি এক এক করে পল্লবিত হয়েছে। এক যাযাবর জনগোষ্ঠীর কৃষি সভ্যতার উত্তরণের সংগ্রামের ইতিহাস এটি। উপন্যাসের কথক ঠাকুরণ লুবিনী। রহুর বংশধরদের তির-চার পুরুষের বিবর্তনের ইতিহাসের সূত্রধর তিনিই। আখ্যানের পর আখ্যান জুড়ে যে ইতিহাস তৈরি হয়েছে তার শ্রোতা ছোট্ট শারিবা। উত্তর বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে

বাজিকর গোষ্ঠীর অবস্থানটি কোথায়? লেখক নিম্নবর্গের ইতিহাসের সূত্রধর সামনে এসে দাঁড়ান, লুবিনির ভাবনাকে পাঠকের বোধগম্যময় অনুবাদ করেন, বলেন—সমস্যা ছিল পীতেমের, সমস্যা ছিল জামিরের, সমস্যা লুবিনর, শারিবার সমস্যা কিছু বাজিকরের। বহু ঈশ্বরের মতো নীতি নির্ধারণ করতো জীবদ্দশায়। কিন্তু লুবিনী কিংবা কোনো বাজিকর তাকে ভগবান, আল্লা ইত্যাদির সমগোত্রীয় ভাবতে পারে না। এই অমোঘ শক্তিধরদের যে পরিচয় বৃহত্তর সমাজের কাছ থেকে সে পায়, তার উপর সে দেবত্ব আরোপ করতে পারে না। কারণ দেবত্ব আরোপ করার সামাজিক স্থিতি তার নেয়। পীতেম আর তার গোষ্ঠীর ভূমি সম্পর্কে 'থিতু' হওয়া উদ্যোগ মধ্যস্বত্তভোগীদের শোষণের পরিচিত ছকে বিদ্ধস্ত হয়ে গেছে, সে খাস জমির প্রসঙ্গেই হোক, আর আধিয়ারের দাসখত দেওয়ার ক্ষেত্রেই হোক। বর্ণহিন্দু সমাজ কোনো সময়েই আদিম জনগোষ্ঠীর কৃষিজমির ওপর অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়নি সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, শবর সকলেই অন্ত্যেবাসী অরন্যে নির্বাসিত। ইংরেজ-সাঁওতাল লড়াইয়ের একটা ছোট আখ্যান সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাসের আবহ এসেছে এখানে। অসম যুদ্ধে পরাভূত সাঁওতাল বাজিকরদের আদি পুরুষ রহুও অসম যুদ্ধে পরাজিত। কিন্তু সে পরাজয় গ্লানিময়। দুর্বিষহ রিয়ালিটির মধ্যে রহুচন্ডালের হাড় সম্বল করে বাজিকরদের ভাবনায় ম্যাজিক্যাল রিয়ালিটি পুরষানুক্রমে বেঁচে থাকে।

বাজিকর গোষ্ঠীর কয়েকজন জমির লড়াইতে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের পক্ষ নেয়। দলপতি পীতেমের ওপর নেমে আসে নির্মম পুলিশি নিপীড়ন। দারোগা সালমাকে ধর্ষণ করে। সালমা ও পীতেমের মধ্যে এক ধরনের প্রেমের সম্পর্ক পুলিশি অত্যাচারের সামনে অসহায় নিরূপায় হয়ে ওঠে। এভাবে সমকালীন সমাজের চিত্র ফুটে ওঠে উপন্যাসে। সমকালীন সমাজের যে চিত্র আমরা লক্ষ্য করি তা সব যুগের সব কালের সমসাময়িক। হয়তো ধরনটা একটু আলাদা। পদ্ধতিটা অন্যরকম। সব ক্ষেত্রেই অসহায় নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক মানুষেরা উচ্চবর্গীয়

ক্ষমতাসম্পন্ন লোকেদের হাতে শোষিত, বঞ্চিত হয়ে থাকে। উপন্যাসে আখ্যানের নাটকীয় মোড়, বাজিকরের মেয়ে পেমার প্রেমে পড়া তাও আবার ওই অত্যাচারী দারোগার ছেলে আনন্দর সঙ্গে। পেমা আনন্দের রক্ষিতা হয়ে থেকে যায়। শরীরের ক্ষুধা নেশা কেটে গেলে দারোগার ছেলে নতুন রক্ষিতা আনে, পেমা বিতাড়িত হয়। প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে পেমা আনন্দকে খুন করে। গর্ভবতী পেমা থানায় গণধর্ষণের শিকার হয়। শোচনীয় যন্ত্রনাদায়ক, মৃত্যুই পেমার অনিবার্য পরিণতি হয়ে ওঠে। বাজিকরের মেয়ে পোমা কাউকে ভালোবেসে সংসার পাততে চেয়েছে. ঘর, সংসার, সন্তান পরিচয় ইত্যাদির লোভে পেমা ধরা দিয়েছিল আনন্দর হাতে। কিন্তু আনন্দ পেমাকে ব্যবহার করে শারীরিক চাহিদা মেটানোর জন্য। এটাই হয়ে থাকে। এই চিত্র শুধু সমসাময়িক কালের বাস্তবতাকে নিদর্শন করে না। এই নাটকীয় মুহূর্ত সব যুগের সমকালীন সময়ের সমস্যা। অভিজিৎ সেনের উপন্যাসে সমকাল যেভাবে উঠে এসেছে তা সত্যিই সাহিত্যে প্রশংসার দাবি রাখে।

একের পর এক আখ্যানও পার্শ্ব— উপন্যাসটিকে বহু কৌণিক মাত্রা এনে দেয়। বাজিকর জামির আর গোয়ালাদের মেয়ে রাধার প্রেমেকে কেন্দ্র করে এক নতুন ও জটিল বৃত্ত তৈরি হয়। এখানের সাম্প্রদায়িক বর্ণহিন্দুর কাছে জমির মার খায়। আবার ঝালোদের ঘরের মেয়ে পাখির সঙ্গে বাজিকরের ঘরের মেয়ের প্রেম ও বিবাহের পরিণতিও হয় করুণ ও বেদনাদায়ক। যা উপন্যাসের ট্র্যাজিক মাত্রা এনে দেয়। নমঃশূদ্র সমাজের মেয়ের বিয়ে হয়েছে বাজিকর ইয়াসিনের সঙ্গে। ইয়াসিন জানতো নমোশূদ্র উচ্চবর্গের হিন্দুর কাছে বেজাত। সে নমঃশূদ্রের দলপতি ভায়রোর কাছে কাতর আবেদন জানায়—

“হামরাদের আপনার জাতে তুলে নেন মালিক।’
—উত্তরে ভায়রো জানায় —‘বাইশ দিগার হামাক

নমোশূদদুর বানাবার হক দেয় নাই বাজিকর,
সদগোপ, নমোশূদদুর কিছুই হবার পারো না।''[৪]

গ্রাম্য সমাজে জাতপাতের দলাদলি ভাগাভাগি, সংঘর্ষ, হিংসার অসাধারণ দলিল এই 'রহুচন্ডালের হাড়' উপন্যাস। ধর্মহীন বাজিকর ধর্ম ছাড়া কোনো সমাজে ঠাঁই পায় না। সমাজের ঠাঁই পাওয়ার আশায়, স্থিতি পাওয়ার আশায় ধর্ম পাওয়ার আশায় বাজিকর যে কোনো ধর্ম, জাত গ্রহণ করতে ইচ্ছুক কিন্তু বাস্তবিক সমাজব্যবস্থায় নিয়ম এতই কঠোর যে বাজিকর চাইলেও যে কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে পারে না। আপাত ধর্মহীন বাজিকর সমাজের পাশাপাশি হিন্দুধর্মের নীচের তলায় জাতপাতের যে সামাজিক অভিঘাত প্রবহমান, অভিজিৎ উত্তরবাংলার একটি অঞ্চলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নিরিখে তার স্পষ্ট ছবি তুলে ধরেছেন। গোপ ও সদগোপে বিভক্ত একই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেও ক্রিয়াকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। আর একইভাবে মালো এবং ঝালো, নমঃশূদ্র, বাজিকর ও মুসলমান সমাজের সম্প্রদায়গত বিভাজনের ইতিবৃত্ত লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষে সাত-আটশো বছর ধরে অন্ত্যজ হিন্দু অস্তিত্বের জন্য আশ্রয় খুঁজেছে ইসলামে আর প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে বৌদ্ধধর্মে। অভিজিৎ সেন তার 'রহুচন্ডালের হাড়' রচনায় অনায়াসে, জাত-পাত, ধর্ম-সম্প্রদায়গত বিভাজনের নগ্ন-ঘৃণ্য রূপটি তুলে ধরেছেন। যা আদিকাল থেকে নিরবচ্ছিন্ন ধারায়, বর্তমান কাল পর্যন্ত রক্তের ধারায় বহমান। ধর্ম এমনই সংবেদনশীল প্রক্রিয়া যেখানে বুদ্ধির জোর খাটে না। অভিজিৎ সেন বাজিকরদের একাংশে ধর্মান্তরিত হওয়ার আখ্যানটি সূক্ষভাবে রচনা করেছেন।

'রহুচন্ডালের হাড়' উপন্যাসে হানিফ মুসলমান সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষ। খানিকটা শুভবুদ্ধিসম্পন্নও সে। তার মুখ দিয়ে কিছু গঠনমূলক চিন্তাধারা শুনতে পাই। হানিফ বাজিকরের মেয়েকে ভালবাসে। থিতু হবার বাসনা মনে করেছে তখন থেকেই সে সমাজের মানুষের কাছে আপন হওয়ার চেষ্টা

করেছে। কিন্তু কেউ তাকে আপন করেনি। স্থান দেয় নি। কিন্তু আজ যদি হাজি সাহেব তাকে আপন করে নিতে চায়। ধর্ম, সমাজ, জাত দিতে চায় তবে সে কি যাবে না? শারিবার এই প্রশ্নে হানিফের যুক্তিবাদী মন বলে ওঠে—

> *''আমি তোমাদের মোছলমান হবার কথাডা ভাবিতেছি। এতে কি বা লাভ হবে? কার লাভ হবে? হিঁদুরই বা কি লাভ? মোছলমানেরই বা কি লাভ? আর বাজিকরেরই বা কি লাভ?''*[৫]

হানিফের মনের গভীর থেকে নির্গত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিতে আখ্যানের দু-লাইন ইঙ্গিতে, রহুচন্ডালের হাড়ের মহাকাব্যিক আয়তক্ষেত্রকে তুলে ধরে বিচার করা যায় না। অসংখ্য চরিত্র, অসংখ্য আখ্যানের বুনোট এক সময় সীমার মধ্যে যাযাবর বাজিকর গোষ্ঠীর সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস এটি। নিরাপত্তাহীনতা, আশ্রয়হীনতা, জীবিকার জন্য বহুবিধ সংগ্রাম, অত্যাচারীর বিপন্নতা, এছাড়া প্রেম, যৌনতা, ধর্ষণ, সবমিলিয়ে সাম্প্রতিক একটা মুলোৎপাটিত যাযাবর গোষ্ঠীর অন্তহীন পথচলা থেকে স্থিতির দিকে যাত্রার সাহিত্যসন্ধানী প্রকাশনা এই 'রহুচন্ডালের হাড়' উপন্যাস। চার-পাঁচ পুরুষের ইতিহাসের, সামাজিক স্থিতির শেষ পর্বে শারিবা বলে ওঠে শত বছর ধরে তারা পথে হেঁটে চলে স্থিতি পাবার আশায়। রাস্তায় আর সুখ নেই, নিরাপত্তা নেয়। পথে বিপদ আগে যা ছিল এখন তা সীমাহীন হয়েছে। নানান কারণে সমাজের মানুষ বাজিকর বাদিয়াকে ছিঁড়ে খায়। স্থিতি পেতে চাইলেও বাজিকর স্থিতি পায় না। কারণ বাজিকরের ধর্ম নাই। বাজিকর জনগোষ্ঠীর একাংশ ক্রমে স্থিতি পায়। হানিফের উদ্যোগে আর্থিক স্থিতির রূপালী রেখা দেখে আকালু সালাম। অন্যভাবেও অনেক বাজিকর সামাজিক স্থিতি পায়। অভিজিৎ সেন এই উপন্যাসে আটের দশকে উত্তরবাংলার যাযাবর সম্প্রদায়ের মর্মবেদনাকে তুলে ধরেছেন। বাজিকর গোষ্ঠী, কোন জাত নয়, ধর্মনয় এখানেই তাদের মূল সমস্যা। তাই

তারা মানুষ হয়েও মানুষ হিসেবে দেশে, রাষ্ট্রে গণ্য হয় না। এরকম যাযাবর ভারতবর্ষে এখনও রয়েছে, যাদের নিজস্বতা বলে কিছু নেই। নাম-ঠিকানা-পরিচয়হীন, ধর্মহীন, জাতহীন এই মানুষগুলোর অন্তর্বয়ানকে অভিজিৎ সেন তার 'রহুচন্ডালের হাড়' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন যথার্থ রূপে।

অভিজিৎ সেনের 'ছায়ার পাখি' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে। এই উপন্যাসের বিস্তার ষাটের দশকের চীন ভারত যুদ্ধ, ভারত পাক যুদ্ধ পেরিয়ে সত্তরের দশক ও আশির দশকের খানিকটা সময় নিয়ে এই উপন্যাসের সময়কাল। এই উপন্যাসে অসহায় প্রান্তিক মানুষের অন্তর্বয়ান, মনস্তত্ত্ব ও রাজনৈতিক অরাজকতার কথা তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। বর্তমান বাংলাদেশের সীমানা ঘেঁষা পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রত্যন্ত গ্রাম ও সেই অঞ্চলের নিরীহ, সাধারণ অকৃত্রিম মানুষ এই উপন্যাসের উপাদান। জলছুঁই, অর্জুনপুর, আড়বেঁকির খাল, পাঠকের পরিচিত জায়গা। চিরি নদী যমুনা নদীর ছদ্মনামে উপন্যাসে আলাদা মাত্রা পেয়েছে। প্রত্যন্ত প্রান্তিক এই অঞ্চলের ধীরে ধীরে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগতে শুরু হয়েছে। সমকালীন অর্থাৎ সত্তর-আশির দশকের পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা, আচার সংস্কার নারীশোষণ, ক্ষমতাশীলদের অত্যাচার নিম্নবর্গীয়দের নিরুচ্চার প্রতিবাদ, রাজনীতি, প্রতারণা ইত্যাদি এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়। ত্রিশ বছরের কংগ্রেসি শাসনের পর বামফ্রন্ট শাসনের শুরু হয় সত্তর-আশি দশকে। এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাস 'ছায়ার পাখি' উপন্যাস। এই বিবর্তনের মধ্যে উপন্যাসের যে সব চরিত্র দেখতে পাওয়া যায় তাদের দুইটি সমান্তরাল ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে - নৌকা বেয়ে চলা গলায় দোতারা ঝোলানো সাগর। নৌকায় যাত্রী অবিবাহিত অবস্থায় অন্তঃসত্ত্বা রাজেশ্বরী সে চলেছে তার সন্তানের পিতার ও স্বীকৃতির খোঁজে। যুগী যোগান বাউল সম্প্রদায়ের সার্থক প্রতিনিধি। আর আছে সুরেশ্বরের স্ত্রী অবহেলিত, বিষাদগ্রস্থ

কৌশল্যা ইত্যাদি সামিজিক অতি পরিচিত চিত্র যা সচরাচর ঘটে থাকে। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে, বশিষ্ট মিত্র ক্ষমতাশালী কংগ্রেসি নেতা। তিনি বেশিরভাগ সময় দিল্লিতে, কলকাতায় থাকেন, নিখিলেশ্বর হাতুড়ে ডাক্তার একসময় কংগ্রেসি রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন। পরণে ধোপদস্তর খদ্দর, সুবিধাবাদী এই ডাক্তার নিখিলেশ্বরের এক ছেলে কলকাতার হাসপাতালের ডাক্তার, আর এক ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। আর আছে বিমল সরকার যার অবৈধ সন্তান রাজেশ্বীর গর্ভে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিমল পার্টির নেতা বেশ সক্রিয়। রাজনৈতিক হানাহানিতে পারদর্শি। রাজেশ্বরীর ভগ্নিপতি গৌরাঙ্গ রাশভারি মাঝারি মাপের কৃষক এবং লালঝান্ডাধারী ফ্রন্টভুক্ত এক ছোট্ট দলে আছে। রাজেশ্বরীকে কেন্দ্র করে সামাজিক ও রাজনৈতিক অচলাবস্থা উপন্যাসে ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠেছে। 'ছায়ার পাখিকে' সমকালীন সময়ের রাজনৈতিক অরাজকতার প্রামান্য দলিল হিসেবে গণ্য করা যায়। এই উপন্যাসে দুটি গোত্রের অবস্থান গত বিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক সমাধানের জন্য এগিয়ে এসেছেন দু'টি অসাধারণ চরিত্র গোপাল আর ভবানীশঙ্কর। গোপাল আপাতত সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে আর স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছে ভবানীশঙ্কর। এদের কৈশোর ও যৌবনের বন্ধু শিশির এখনও সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে রয়েছে। এরা তিনজনেই কলেজ সঙ্গী। কলেজে পড়ার সময় তারা স্বপ্ন দেখেছিল মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানুষকে তার অধিকার ফিরিয়ে দেবে। সমাজসেবায় ব্রতী হয়েছিল এই তিন বন্ধু। কিন্তু পরিস্থিতি তিনজনকে তিনদিকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সংগঠিত প্রয়াস তারা চালাতে পারে না। গোপাল চায়ের দোকান করে জীবিকা নির্বাহ করে রাজনীতির খবরাখবর রাখে। সাধ্যমতো সহযোগিতা করার চেষ্টা করে। ভবানীশঙ্কর একটা প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকতায় জীবন অতিবাহিত করছে। শিক্ষকতার মধ্যে দিয়ে সমাজসেবার কাজ করে চলেছে। আর শিশির একজন সক্রিয় রাজনৈতিক নেতা। শিশির ক্রমে বামপন্থী সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে। বামপন্থী বিপ্লবী রাজনীতির তিন বন্ধুর বিবর্তন

'ছায়ারপাখি' উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

ষাটের দশকের শেষে, সত্তরে দশকের আন্দোলন ও তার পর্বতপ্রমাণ ভুল ভ্রান্তি বাঙালির চিন্তা চেতনায় নব উন্মেষের আঘাত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। যারা এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল, যারা সমর্থন করেননি আর যারা প্রতিবাদ করেছিল তারাও এর ফলে নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। ষাট ও সত্তরের দশকের আন্দোলন গ্রাম বাংলার মানুষকে, তাদের চিন্তাধারাকে মানসিকতাকে ইতিবাচক দিকে বর্ধিত করতে সাহায্য করেছিল। সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। বিশেষ করে রাজনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদদেরও ভাবিয়ে তুলেছিল। যোগীর আখড়ায় সাগর আজ রাজেশ্বরীর নিরুচ্চারিত প্রেমকে কেন্দ্র করে উত্তর বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে রাজনীতির ঘুর্ণাবর্ত তৈরি হয়। একটার পর একটা ঘটনা ঘটতে থাকে। ঘটনা ও দুর্ঘটনার ফলে সাধারণ মানুষও ভীত ও সন্ত্রস্ত। উপন্যাসের শুরুতেই সাগর এক রাজনৈতিক খুনের ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে যায়। রাজেশ্বরীকে নিয়ে রাজনৈতিক জটিলতা সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে কৃষি জমি হাতানোর প্রক্রিয়া চলতে থাকে রাজনৈতিক অপশাসনের সহায়তায়। রাজেশ্বরীর বাবা গোপীনাথ, বিমলের কাছে নিজের খেতের অধিকার চাইতে গেলে লম্পট নেতা রাজেশ্বরীর বাবাকে টাকা দিয়ে বিদায় করতে চায়। এদিকে অসহায়, অপলা, নিরীহ রাজেশ্বরী স্বপ্ন দেখে তার সন্তান স্বীকৃতি পাবে, সে ঘর পাবে। আবার রাজনৈতিক এই ডামাডোলের সময় ভয়াবহ বন্যা প্রতীকি রূপ নিয়ে আসে। মুমূর্ষ গোপাল মারাত্মক জন্ডিসে আক্রান্ত। গোপালের জন্ডিস কি এখানে রাজনীতির ভাইরাসের ইঙ্গিতবাহী? আর চিকিৎসার জন্য এলাকার রাজনীতিতে সহকর্মী বামপন্থী নেতা শিশিরের দৌলতে কলকাতা পাড়ি দেবার সুযোগ পায় সে। এককালের সৎ, আদর্শবাদী পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী গোপাল সরকারি ত্রাণ বিলির কাজে নিযুক্ত হেলিকপ্টারে করে যাওয়ার সুযোগ পায়। এটা হয়তো গোপালের

মতো এক সৎ বামপন্থী মানুষের সরকারি স্বীকৃতি, মন্দ কি! তাই-ই বা ক'জন পায়? হেলিকপ্টারে উঠে গোপালের বাহ্যজ্ঞান প্রান্তসীমায় পৌঁছেছে, সঙ্গে তার দুই বন্ধু ভবানীশঙ্কর ও শিশির। হেলিকপ্টার তেল নেবার জন্য বাগডোগরা হয়ে কলকাতা যাবার পথে গোপাল কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পায়। কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনাগলা হেমসুন্দর দৃশ্য ইঙ্গিতবাহী। উজ্জ্বল হেমকান্তির মধ্যে তিন বন্ধুর যাত্রাপথের ইঙ্গিত মেলে। তারা যে আদর্শ নিয়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিল তাতে তারা সফল না হলেও সফলতার পথ আজ তারা খুঁজে পেয়েছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন মুমূর্ষ গোপাল তার দুই হাত দুই বন্ধুর হাতে নিয়ে আবেগে বলে ওঠে ঐখানেইতো যাওয়ার কথা ছিল তাদের? ঐখানেই কি যাচ্ছে তারা?

অর্থাৎ 'ছায়ারপাখি' উপন্যাসে সমকালীন রাজনীতির ক্ষেত্রে দুর্নীতি যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে সৎ আদর্শবাদী কর্মীও। বিমল রাজেশ্বরীকে স্বীকৃতি দেয়নি। বিমলরা এরকমই হয়। সব সমকালেই তারা শোষণ, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন করে থাকে। আর এটা নিয়মে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। তবুও রাজেশ্বরী স্বপ্ন দেখে থাকে। রাজেশ্বরীর প্রতি সাগরের নিরুচ্চার প্রেম সর্বকালের দুর্বল প্রেমিকসত্তার উদাহরণ। অর্থাৎ 'ছায়ারপাখি' উপন্যাসে সমজের উত্তরণ ছায়াতেই থেকে গেছে, আলো পায়নি। আলোর পথ পেয়েছে। অভিজিৎ সেন ছায়ারপাখি উপন্যাসে সমকালীন সময়ের এই আলো ছায়াময় পরিস্থিতিকে দক্ষ কারিগরের মতো পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। এখানেই তাঁর শিল্পীসত্তা সার্থক হয়েছে।

গত শতকে আটের দশকের প্রথম দিক থেকেই বিশ্বহিন্দু পরিষদে তাদের জঙ্গীপনা জাহির করতে শুরু করেছিল সারা দেশ জুড়ে। তার ওপর রামজন্মভূমি আন্দোলন বিশ্বহিন্দু পরিষদের পাশে অনুকূল হাওয়া লাগিয়েছে তা রাজনীতি না করা মানুষও জানতে ও বুঝতে পারে। দিনের পর দিন বিশ্বহিন্দু পরিষদের যজ্ঞ রাম জন্মভূমি আন্দোলন, জয় শ্রীরাম ধ্বনি ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে বিস্তার লাভ করছিল। সব মিলিয়ে একধরনের গণসাম্প্রদায়িকতার

জন্ম নিচ্ছিল। অসাম্প্রদায়িক, শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিরাও এই সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। এই আটের দশকের সমকালীন সময়ের নিরিখে অভিজিৎ সেনের 'আধার মহিষ' উপন্যাসটি রচিত। প্রকাশকাল হিসাবে 'আঁধারমহিষ' ও 'ছায়ারপাখি' সমসাময়িক। দু'টি উপন্যাসেই অঙ্কিত গ্রাম্য চরিত্রগুলো প্রায় একই রকম। সেই নদী নালা, খাল বিল, ঘাট-গঞ্জ, গ্রাম্য প্রান্তিক ও মধ্যবিত্ত কিছু মানুষজন। উপন্যাসের শুধু আখ্যানের হেরফের হয়, বয়ান একই থাকে। 'ছায়ারপাখি'তে আমরা দেখি দলীয় রাজনীতির অবক্ষয়ের চিত্র। আর 'আঁধার মহিষে' আমরা দেখি হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির ভয়াবহ বিনষ্টির কাহিনি। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা দেখি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধনের পীঠস্থানে লেখক পাঠককে নিয়ে গেছেন। 'সাধারণ দীঘি' আসলে হয়তো 'সুবর্ণ দীঘি' উভয় সম্প্রদায়ের লোরে কাছেই পবিত্র তীর্থ। হিন্দু যেমন আছে শীতলা, বুড়িমা, মুসলমানের পীর। কিন্তু দুই সম্প্রদায়ের মানুষই এই লোকায়ত পীঠস্থানের ভক্ত। 'সোবারণ দীঘি'তে চৈত্রমাসে মেলা হয়। মেলায় উভয় সম্প্রদায়ের স্থানীয় মানুষ ছাড়াও আসে সীমান্ত পার হয়ে ওপার বাংলার মানুষ।

উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিবেশি হিসাবে বাস করছে কয়েক শত বছর ধরে। হানাহানি, অবিশ্বাস, ধর্মীয় দ্বন্দ্ব ছিল না তা নয়। ধর্ম বিগত দিনেও ব্যবসা ছিল এখন রাজনৈতিক সওদা। অনেকের মতো অভিজিৎ সেনও অনুভব করেছিলেন যে ঝড় আসছে। এই সাম্প্রদায়িক ঝড় শুভবুদ্ধি সম্পন্ন বিবেকবান মানুষও ঠেকাতে পারবে কিনা তাতে সন্দেহ প্রকাশ করেন ঔপন্যাসিক।

উপন্যাসে উত্তর বঙ্গের এক গ্রামাঞ্চলের স্কুল কলেজ শিক্ষকরা নগ্নভাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার প্রবল সমর্থক হয়ে ওঠে। ব্যতিক্রম শুধু সুভদ্র। তার অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমগ্র এলাকার বিভৎস্য নগ্ন সাম্প্রদায়িক চেহারাটি

স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুভদ্রের বয়ানই শেষে লেখকের বয়ান হয়ে ওঠে। এই অসাম্প্রদায়িক উদারমনস্ক সুভদ্রেরই আত্মীয়া অলকানন্দা। অলকানন্দার বিয়ে হয় ওই অঞ্চলের এক স্কুল শিক্ষক কামালের সঙ্গে। উভয়ে প্রণয়াবদ্ধ হয়েছিল, তার পর সুভদ্রর প্রচ্ছন্ন আশ্রয়ে তাদের বিবাহের পরিণতি হয়। সাম্প্রদায়িকতার বিষ কীভাবে এদেশে প্রেমের সম্পর্ককেও বিনষ্ট ও ধ্বংস করে তারই একটা চিত্র 'আঁধার মহিষ'-এ আমরা লক্ষ্য করি। উপন্যাসে অলকানন্দা ধর্ষিতা হয়। অভিজিৎ সেন অত্যন্ত সাবলীলভাবে তাঁর উপন্যাসের আখ্যানভাগ নির্মাণ করেন। বিধ্বস্ত কামাল বলে ওঠে—

> *''কী পরিচয় এদেশে আমার? আমি কী এখানে একটা সম্মানজনক চাকরি পাব? ওই মফস্বল শহরে কেউ কি আমাদের একখানা বাড়ি ভাড়া দেবে? বাড়িতে কাজ করার জন্য ঝি পাবো আমরা?''* [৬]

অথচ কামালই জানে এবং বিশ্বাস করে—

> *''আমি সেই অর্থে মুসলমান নই কিংবা আমার স্ত্রী অলকানন্দ সেই অর্থে হিন্দু নয়। আমরা শুধু দুই সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেছি।''* [৭]

'আধার মহিষ'-এ অভিজিৎ সেন দেখান, কীভাবে খাকি হাফপ্যান্ট পরা সংঘকর্মীরা প্রত্যন্ত গ্রামেও শিকড় গেড়ে বসে আপাৎকালীন তৎপরতায়। কীভাবে ঈদে কুরবানীতে দুই সম্প্রদায়ই ভীষণ স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে। কীভাবে মন্দির মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা ধর্মান্ধতার নিদর্শন হিসাবে বেড়েই চলে। বাড়তে থাকে অযোধ্যা মন্দিরের জন্য রামনামঙ্কিত ইট সংগ্রহের উদ্যোগ। উগ্র হিন্দুত্বের লিফলেট বিতরণ চলতে থাকে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য প্রশাসনিক উদ্যোগে সভা আমাদের পরিচিত প্রায় সর্বভারতীয় ইতিহাস। প্রশাসনও এখানে সাম্প্রদায়িক

ভাবনায় যুক্ত। এক বিডিও নিয়মিত একটা সাম্প্রদায়িক সংঘের পৃষ্ঠপোষক। সংখ্যালঘুরা চিরকালই সাম্প্রদায়িক। তাদের বেঁচে থাকার অর্থই হল সাম্প্রদায়িক হওয়া। মুসলমানরা ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু, হিন্দুরা বাংলাদেশে সংখ্যালঘু আর উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে ইংল্যান্ডে সংখ্যালঘু। এছাড়া কালোরা ফরাসীদেশে সংখ্যালঘু ও প্রবল সাম্প্রদায়িক। সংখ্যালঘুর উপরে সংখ্যাগুরুর অত্যাচার নিরীহ সংখ্যালঘুদেরও প্রতিহিংসাকামী করে তোলে। 'আঁধার মহিষ' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক নব্বইয়ের দশকের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টির চিত্রকে তুলে ধরেছেন। সমকালীন সময়ের ধর্ম, সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে নোংরা রাজনীতি ও মানুষের মধ্যে নোংরা সাম্প্রদায়িকতাকে ঔপন্যাসিক এখানে তুলে ধরেছেন। যার ফলে স্কুল শিক্ষক কামাল ও তার স্ত্রী অলকানন্দার জীবন অকালে নষ্ট হয়ে যায়।

অভিজিৎ সেনের 'দেবাংশী' ও 'বর্গক্ষেত্র' উপন্যাসের পরিসর তুলনায় ছোট। পরিসর তুলনায় ছোট হলেও বিষয়বস্তুর বিশালতা কম নয়। 'দেবাংশী' উপন্যাসে দেখি লোহারা গ্রামের সারবান লোহার দেবীর অংশে দেবাংশীতে পরিণত হয়। তার ওপর মনসা দেবীর ভর হয়। তখন নাকি স্বয়ং দেবতাই তাকে ভর করে থাকে, এমনই লোকের বিশ্বাস। অভিজিৎ সেন 'দেবাংশী' উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের, বলতে গেলে গ্রাম্য, নিম্নবর্গীয়, প্রান্তিক মানুষের আচার আচরণ, ধর্মীয় রীতি নীতি অর্থাৎ সমকালীন গ্রাম বাংলার সময়কে তুলে ধরেছেন। তথ্যচিত্রের মতো আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য। একদিকে যেমন অন্ধবিশ্বাসে আচ্ছন্ন মানুষ বিশ্বাসের উপর ভর করে দেবাংশীর ঘেরা থানে মানত রক্ষা করে। অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক, জমিদারি প্রথায় ভাগচাষীদের দূরবস্থার কথাও বর্ণনা করেছেন। দেবাংশী সারবান লোহারের ওপর যখন দেবীর ভর হতো তখন সে যা বলে তা সবই দৈববানী। সারবান নিজেও তার ঐশি ক্ষমতায় বিশ্বাস করতো। সে

কাউকে মাদুলি দিতো, কাউকে অন্য কোনো নিদান। আশে পাশে দশ বিশটা গ্রামে দেবাংশী ঐশি ক্ষমতার কথা শ্রদ্ধাভরে মেনে নিয়েছিল। দেবাংশী ক্রমে উত্তর বাংলার এক বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলে জোতদার, জমিদার, আধিয়ার, কৃষক, ভাগচাষী, জমির মালিকের সমস্যাসঙ্কুল আবর্তে জড়িয়ে পড়ে। তাকে গরীব ভক্তের নানা ধরনের আর্জি শুনতে হয়। বিচার করতে হয়। যেমন—

> *'"—মাতাজি, মালিক আধি উচ্ছেদ করবা চায়।'*
>
> *—মাতাজি, মোর ঘরেৎ আগুন লাগায়া মোক মারবার চায় কে?'*
>
> *'—মাতাজি, জামাইটাকে খুন করলো জোদ্দার। মেয়া মোর বেধবা হোই ঘুরি আসিলো। তাতেও সোয়াস্তি নেই। রাতভর কু-লোকের আনাগোনা মোর ঘরের ছামুতে। মোর ইজ্জৎ ছুবলাবার চায়।''*[৮]

গ্রামের ক্ষমতাশালী জোতদার দৈত্যারি তার আধিয়ার চাষী সেতুমণ্ডলকে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে চায়. দৈত্যারি দেবাংশীকে মিথ্যা সাক্ষী দিতে বলে, কিন্তু দেবাংশী তাতে রাজি হয় না ফলে দেবাংশী ভীষণভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। কাকতালীয়ভাবে হোক আর দৈব ক্রমেই হোক দেবাংশীকে অপমান করার ছয়-সাতদিনের মাথায় সর্পাঘাতে দৈত্যারির মৃত্যু হয়। বড়ই যন্ত্রণাদায়ক সেই মৃত্যু। ফলে দেবাংশীর উপর মানুষের বিশ্বাসের মাত্রা আরও বলিষ্ঠ হয়। আবার দেবাংশী সারবান ও বিভিন্ন ঘটনার আবর্তকে ভয় পায়। সে মনসার কাছে প্রার্থণা করে— *"ই দায় থিকা মোক এবার রেহাই করি দে মা।''*[৯] দেবাংশী সারবান লোহার তার অলৌকিক ক্ষমতা থেকে মুক্তি পেতে চায়। এদিকে দৈত্যারির মৃত্যুর পর তার ছেলে বিনোদ শহর থেকে ফিরে আসে। শহুরে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে বিনোদ আসক্ত ও দুশ্চরিত্র প্রকৃতির

মানুষ। সে সেতুর উপর প্রতিশোধ নিতে চায়। প্রতিশোধের চেয়েও বেশি হয়ে ওঠে তার জৈবিক চাহিদার লিপ্সা। সেতুর বিবাহিতা কন্যা বারুণীকে দেখে তার লালসা বাড়ে। একদিন বিনোদের চক্রান্তে বারুণী লুঠ হয়, ধর্ষিতা হয়। বারুণী দেবাংশীর কাছে বিচার চায়। কিন্তু দেবাংশী অসহায়। দৈবশক্তিতে এর প্রতিকার হয় না। অসহায় দেবংশী বলে ওঠে। আমি সারবান লোহার, বাপের নাম হীরামন লোহার তোমাদের আর দশজনের মতো একজন সাধারণ মানুষ। শ্রাবণ সংক্রান্তির মেলায় মনসার পুজোয় দেবাংশীর ওপর ভর হয়। বারুণী তার প্রতি অন্যায়ের বিচার চায়। কিন্তু দেবাংশী তার ঐশি ক্ষমতা থেকে বেরিয়ে আসে এবং সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছোড়ে, যে সমাজে যত সব অন্যায়, অত্যাচার, লুঠ, ধর্ষণ এ সব থেকে রেহায় এনে দেওয়ার দায়িত্ব দেবাংশীর একার নয়। এ দায় সবার। সব মানুষকে একসঙ্গে এর প্রতিবাদ করতে হবে। সমাজকে সংঘবদ্ধ হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। তারপর দেবাংশী বারুণীর হাত ধরে তার প্রতি অন্যায়কারীকে সনাক্ত করতে বলে, সনাক্ত করেও। সমবেত জনতা অন্যায়কারী বিনোদ ও তার সঙ্গীদের শাস্তি দেয়। এভাবে দেবাংশী ঐশি ক্ষমতার অধিকারী থেকে সাধারণ মানবে পরিণত হয়। এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। মানুষের সংঘবদ্ধ শক্তিকে, চিনতে সাহায্য করে দেবাংশী। অন্যায়ের প্রতিবাদ নিজেকেই করতে হবে। বিচারের অধিকার জনতার হাতেই থাকবে এই রূপান্তর সমাজব্যবস্থায় বদল আনে। প্রাচীনের অন্ধবিশ্বাসের জড়তা ভেঙে বাস্তবের ক্ষেত্রে অবতরণ করেছে সারবান। এখন থেকে সে আর দেবাংশী নয়; কিন্তু সে এখন জন সাধারণের নেতা। সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। অভিজিৎ সেন দেবাংশী উপন্যাসে সমকালীন সময়কে যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈপ্লবিক রূপান্তরকেও অঙ্কন করেছেন। এবং পাঠকের কাছে প্রচ্ছন্ন একটি তথ্য পরিবেশিত করেছেন।

'বর্গক্ষেত্র' উপন্যাসটি 'এক্ষণ' পত্রিকায় ১৯৮১ সালে বর্ষা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার একটি অঞ্চলের কাহিনি এতে গ্রথিত হলেও মূলত সারা বাংলার চিত্রই এখানে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। দক্ষিণ কাশিয়ানির দৈত্যবংশকে কেন্দ্র করে বর্গক্ষেত্র উপন্যাসে মূল কাহিনি ক্ষেত্র। এই দৈত্য বংশটি কাশিয়ানিতে গত একশো বছর ধরে আছে এবং বিভিন্ন রূপ কথার জন্ম দিয়েছে। এরা চার পুরুষ ধরে কাশিয়ানিতে আছে। তার আগের ইতিহাস সবারই অজানা। এই দৈত্যবংশের পুরুষেরা দৈর্ঘ্যে প্রায় সাতফুটের কাছাকাছি আর মহিলারা কেউই পাঁচফুট আট ইঞ্চির কম নয়। এদের চেহারা দৈত্যাকৃতি হলেও মন তাদের শিশুর মতোই সরল ও বিশ্বাসী। তাই জমির মালিক শচীকান্ত রায় তাদের আধিয়ার উচ্ছেদ করতে পারে জেনেও বর্গা রেকর্ডের ক্যাম্পে অফিসারের সামনে বলে —আমরা বাবুর চাকর। চার পুরুষ ধরে চাকরের কাজ করছি। ফলে খানাপুরি বুঝারতের মাঠ খসড়ায় জোতদার শচীকান্ত রায় তার জমিতে বহাল ও স্বহাল থাকে। জমির দাগগুলির পাশে— *"আধি দং আস্তিকমাল গং"*[১০] এই বয়ানটি লেখা হয় না। ঔপন্যাসিক নিজস্ব বয়ানে সরকারি অফিসে, পঞ্চায়েতের দূর্নীতির তথ্যনিষ্ঠ ছবি তুলে ধরেন। ১৯৬৭-৬৮ সালের জমির লড়াই ও শরিকী সংঘর্ষের বিশ্বস্ত খণ্ডচিত্রে দেখা যাচ্ছে—

> *"ভাঙ্গির একশো একর জমি দখল হয় এক নিপুন শৃঙ্খলার মধ্যে। ভোর হতেই একশো মানুষ দুশো বলদ জমিতে নেমে পড়ে এবং প্রবল হাট, হাট, হুরহুর এই রণধ্বনিতে লাঙলের ফলায় মাটি বিদীর্ণ হতে থাকে। তাদের মধ্যে দেখা যায় দৈত্য পরশুরাম মালকেও।"*[১১]

ঔপন্যাসিক অভিজিৎ সেন আশির দশকের পশ্চিমবঙ্গের অপারেশন বর্গাকে

কেন্দ্র করে এক প্রচ্ছন্ন ছবি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে জমিদার, জোতদারেরা অফিসার প্রশাসনদের মদত নিয়ে বর্গাচাষীদের উচ্ছেদ করে। কীভাবে অন্যায়ভাবে জমি থেকে বেদখল করে তার চিত্র তুলে ধরেন। শুধু বিশ্বাস ভঙ্গের জন্য আস্তিকমাল এর মতো সাতফুট দৈর্ঘ্যের দৈত্যাকৃতি মানুষের মৃত্যু হয়। পরশুরাম মাল অন্যায়ের প্রতিবাদ করে জমির দখল ছাড়ে না। ধীরে ধীরে সমস্তগ্রামের ও আশে পাশের গ্রামের মানুষজনও পরশুরামের প্রতিবাদে সামিল হয়। শেষ পর্যন্ত উপন্যাসে গণজাগরণের ছবি পরিলক্ষিত হয়, যার নেতৃত্বে দৈত্য বংশের পরশুরাম।

অভিজিৎ সেন তাঁর 'অন্ধকারের নদী' উপন্যাসের নামকরণের মধ্যেই উপন্যাসের বিষয়বস্তুকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। সত্তরের দশকের নোংরা রাজনীতি। পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলাপরিষদ, বিডিও ইত্যাদি মিলে কিভাবে জনগণের টাকা আত্মসাৎ করে। বিডিও অশোক কাজ করতে চাইলে তাকে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা মন্তাসনদের সম্মুখীন হতে হয়। অশোক ও তার স্ত্রী ইরাবতী মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে। সবমিলিয়ে নোংরা রাজনীতির শিকার হয় অশোক ও ইরাবতীকে। অন্ধকারের নদীর ঘটনাস্থল চরিত্র ও ভাষার একটা আঞ্চলিকতা আছে। কিন্তু এ উপন্যাস আঞ্চলিকতায় সীমাবদ্ধ হয়ে নেই। উপন্যাসের বিষয়বস্তু তৎকালীন বাংলার কাহিনি থেকে বর্তমান বাংলার কাহিনিতে পরিণত হয়েছে। অশোক ও ইরাবতী গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগাযোগ ঘটিয়ে উপন্যাসটিকে শুধুমাত্র গ্রামীণ অভিজ্ঞতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে তার বিস্তৃতি ঘটাতে সাহায্য করেছেন। বাংলার সাধারণ মানুষ সত্তরের দশক কি তারও অনেক আগে ব্রিটিশ শাসনেও যে রূপ দূরবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল বর্তমানে একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এসেও সেই দূরবস্থাও যন্ত্রণার কোনও পরিবর্তন হয়নি। কারণ শহর থেকে নীতি নির্ধারিত হয়ে গ্রামে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে। রাজনৈতিক অরাজকতার

অন্ধকারে গ্রাম্যজীবন ঢাকা পড়েছে। পঞ্চায়েত, ব্লক, থেকে শুরু করে সমস্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা আজ দূর্নীতিগ্রস্ত।

উত্তরবঙ্গে থাকাকালীন অভিজিৎ সেন তাঁর কর্মজীবন থেকে এই সমস্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাঁর দেখা চিত্রগুলিকেই তিনি উপন্যাসে তুলে ধরেছেন নানা ভঙ্গিমায়। কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা তাঁকে দিয়েছে সাহিত্য রচনার প্রচুর কাঁচা তথ্য। সত্তরের দশক তাঁকে দিয়েছে নৈতিকতা ও সাহস। 'অন্ধকারের নদী' উপন্যাসের নায়কের মতো মানুষের মূল্যবোধের অধঃপতনের ব্যাপকতা লক্ষ করেন। অনুভব করেন একই সঙ্গে সৎ, নিরপেক্ষ ও নির্বিরোধ থাকা সম্ভব নয়। মূলত 'অন্ধকারের নদী' উপন্যাসটি ১৯৮৪-৮৫ সালে লিখেছিলেন অভিজিৎ সেন। জলপাইগুড়ির 'লালনক্ষত্র' পত্রিকা ১৯৮৬ শারদীয় সংখ্যায় উপন্যাসটি প্রকাশ করে। শেষে ১৯৮৮ সালে 'একুশে' নাম প্রকাশনী থেকে জুলাই মাসে উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু উপন্যাসটি মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সত্তরের দশকের নোংরা রাজনীতি।

অভিজিৎ সেন 'স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা' উপন্যাসটি রচনা করেন ১৯৯৬ সালে। ১৯৯৭ 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায় শারদ সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু গ্রন্থাকারে 'দেশ পাবলিশিং'থেকে ২০০০ সালের কলকাতার বইমেলায় প্রকাশিত হয়। উপন্যাসে '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ পূর্বপাকিস্তান-পশ্চিমপাকিস্তান যুদ্ধ, এপার বাংলা ওপার বাংলার মানুষদের ভূমি-উচ্ছেদ, হিন্দু-মুসলমান উভয়েই ঘরছাড়া ইত্যাদি ঘটনা মূল বিষয়বস্তু। উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ সময় ঔপন্যাসিক স্বয়ং উল্লেখ করেছেন। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সরোজ জন্ম সম্ভবত ১৯৪১ কিংবা '৪২ সালে। উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ১৯৭১ সালের আন্দোলন। সরোজ তার তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতাকে বুকে করে নিয়ে দাঁড়াতে চাওয়া এক যুবক। ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট, মধ্যরাতে যখন স্বাধীনতা এল তখন সরোজ এর বয়স ৬ বছর। ছয় বছরের বালক শিশু সরোজ তখন কোনো কিছুই অনুভব

করতে পারেনি। সরোজের পিতামহ অমিয়নাথ পঁচাত্তর বছর বয়সী বৃদ্ধ তিনিও কিছু অনুভব করতে পারেননি। কিন্তু সরোজের বাবা নিখিলনাথ, তার বাবা অমিয়নাথকে জানায়—

> *"আপনি কি জানেন গতরাতে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে।"* [১২]

এই অর্জিত স্বাধীনতায় কত রক্ত, খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ, লুঠপাটের মধ্যে দিয়ে এসেছে তার ইয়ত্তা নেয়। প্রায় ৬ লক্ষ মৃত। ১ কোটি ৪০ লক্ষ্য গৃহচ্যুত। প্রায় একলক্ষ নারী অপহৃত। অর্জিত স্বাধীনতার জন্য নিরীহ সাধারণ মানুষকে দাম চুকাতে হল। স্বাধীনতা অর্জনের চাইতে মানুষের ত্যাগই বেশি। এই সময় নক্সালবাদী আন্দোলনে সরোজ পড়েছিল। উপন্যাসে সরোজ কেন এই নক্সাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে? তার ভূমিকা স্পষ্ট নয়। কেন সরোজ কলকাতা থেকে পাঁচশো মাইল দূরে 'মাঝের বন্দর' নামের একটি ছোট শহরে আসল নাম (মানিক) লুকিয়ে, ছদ্মনামে (স্বরোজ) নাম নিয়ে গোপন ভাবে থাকতে চেয়েছিল? ষাট-সত্তরের দশকে বিপ্লব প্রচেষ্টা অনেকটাই ছিল আত্মসচেতন বাঙালি আবেগের পরিণাম, এই কথাটা সরোজ স্পষ্ট করতে পারে যখন সে বলে—

> *"সে কি সত্যিই বিপ্লব করার জন্য বিপ্লবী পার্টিতে যোগ দিয়েছিল? বিপ্লবী পার্টিতে যোগদান কি অন্য কিছু থেকে রেহাইয়ের নামান্তর?"* [১৩]

মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি সুলভ সরোজের মতো বিপ্লবীরা হঠাৎ শ্রেণিচরিত্র পাল্টে কৃষক-শ্রমিকের মুক্তিদাতা হিসেবে হাজির হলে যা হওয়ার তাই হয়। সারা পৃথিবীতে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম একটা কারণ হয়তো সরোজের ব্যর্থতার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়।

নকশাল আন্দোলনের চিন্তাধারায়, ব্যর্থতায় ভুল সিদ্ধান্তে সরোজের মধ্যে এক নৈরাশ্য বোধ কাজ করে। উত্তরবঙ্গের মাঝের বন্দর নামক জায়গায় আশ্রয় নেয় সরোজ। জায়গাটা উত্তর-পূর্ব পাকিস্তান সীমানায়। সরোজ কলকাতা থেকে পালিয়ে যখন অজ্ঞাতবাসে এসেছিল তখন তার জীবন ছিল নিস্তরঙ্গ। সে সময় শুরু হয় পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের নিজস্ব মুক্তি সংগ্রাম। সরোজ দু-একজন বন্ধুর পরামর্শ ও সহায়তায় সরে এসে দাঁড়াল এবং একটা শরণার্থী শিবিরের অধ্যক্ষের কাজ নিল। তফাৎ প্রথমটাই সে ছিল সৈনিক এখন সে সরাকরি লোক ও নিরাপদ দূরত্বের দৃষ্টি মাত্র। কীভাবে সে দেখে এই মুক্তিযুদ্ধকে?—

> *"মুক্তিদের রাজনীতি খুব পরিস্কার না। ভারতীয় বাহিনী প্রশিক্ষণ দিয়ে ভিতরে পাঠাচ্ছে তাদের। পাক বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে অন্তর্ঘাত করে ফিরে আসে তারা মুক্তি যুদ্ধের সামগ্রিক রাজনীতি একেবারে অসচ্ছ তাদের কাছে।"* [১৪]

এই মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে উপন্যাসে এসে ভীড় করে আরও অসংখ্য চরিত্র। তার মধ্যে দু-তিনজন ঔপন্যাসিক মোটা দাগে আঁকতে চেয়েছেন। তাদের কাহন, যন্ত্রনাকে তুলে ধরে দেখাতে চেয়েছে সমকালীন সময় ও তার দূরবস্থাকে। তৎকালীন সমকাল কীভাবে মানুষের বাড়ি-ঘর, সুখ-শান্তি, আত্মীয়-স্বজন, দেশ, বন্ধু-বান্ধব, কর্মস্থল ত্যাগ করে কীভাবে বিভিন্ন অরাজকতার মধ্যে দিনপাত করতে হয় তার ইতিহাস নির্দেশ করে। হেনা, সতী, রোজি পারভেজ, আব্দুল কুদ্দুস, সরোজ ইত্যাদি চরিত্রগুলি বিভিন্ন ঘটনা, দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। 'হেনা' ইউনাভির্সিটির ছাত্রী হেনা পূর্বপাকিস্তানের মাওবাদী কমিউনিস্ট দলের যোগ দিয়ে মুক্তি সংগ্রামে কেউ বা সংগ্রাম গঠনের কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। একসময় খান সেনাদের হাতে ধর্ষিতা হয়। মুক্তিবাহিনীর

পাল্টা আক্রমণে ছাড়া পায়। তারপর থেকেই হেনা অনেকটাই বাস্তববাদী, স্পষ্টবাদী, যুক্তিবাদী, স্মার্ট নাগরিক হয়ে যায়। রাত নটা বেজে যাওয়ার পর বাড়িতে ঢুকেছে হেনা। উদ্বিগ্ন মায়ের জিজ্ঞাসা কোথায় ছিলি এত রাত পর্যন্ত? হেনা স্বাভাবিক ভঙ্গিতে উত্তর দেয়—

> *"মা আমাদের কারোরই আর চরিত্র নষ্ট হওয়ার ভয় নেই। অন্তত, যে উদ্বেগে রাত নটাকে তুমি এত রাত বলছ তার কি সত্যিই কোনো কারণ আছে।"* [১৫]

সতী ও ইউনিভার্সিটির ছাত্রী, ভালো গান জানে। বিয়ে হয়েছিল তার বড় ব্যবসায়ীর সঙ্গে পরে বনিবনা না হওয়ায় বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। এখন মায়ের সঙ্গেই থাকে। সেও ধর্ষিতা হয়, আপনজন ও পরজনের কাছে। রোজি পারভেজ, সতীর মতোই। রোজি ধর্ষিতা হবার পর এই উপলব্ধিতে স্থিত হতে পারে যে,

> *"কোনো মেয়ে মানুষ যদি দু'একটা সাধারণ সংস্কার ভুলে যায়, তাহলে তার পক্ষে জীবন ধারন পুরুষমানুষের থেকে অনেক অনেক সহজ এবং আরামের হয়।"* [১৬]

এই রোজি ভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সতীত্বের ধারণাকে নিয়ে ধরে বসে থেকে সে কি করবে, পেটে তার খিদে। রোজি পুলিশ অফিসারের গালে চড় বসিয়ে 'সিডিউস' করার কথা ভাবে। আবার সে রেডক্রসের যে লোকটা খাবার দেয় তাকে চুমু খায়, যাতে করে সে যেন আবার আসে। একটা যুদ্ধ, রাষ্ট্রবিপ্লব, সংগ্রাম, দূরবস্থা, অন্যায় মানুষের সচেতন মূল্যবোধগুলিকে নষ্ট করে দেয়। রাষ্ট্রবিপ্লব, যুদ্ধ আর নারীসমস্যা এই তিন ধরনের সমস্যার মিলন

স্থলে দাঁড়িয়ে থেকে সরোজ জীবনের তাৎপর্য খুঁজে চলে। নকশাল আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের আন্দোলনে প্রেক্ষাপটে রচিত 'স্বপ্ন ও অন্যান্য নীলিমা' উপন্যাসটি সমকালী সময়ের একটি বিশিষ্ট আলেখ্য। ঔপন্যাসিক অভিজিৎ সেন সমকালীন যুদ্ধ, রাজবিপ্লব, রাজনীতিকে যেমন একদিকে তুলে ধরেছেন তেমনি এই সমস্যার ফলে উদ্ভুত নারীশোষণের মতো সমস্যা, ধর্ষণ, খুন, শরণার্থী, চোরাচালান ইত্যাদি দূরবস্থাকেও তুলে ধরেছে।

উপরোক্ত রহুচন্ডালের হাড়, ছায়ার পাখি, বর্গক্ষেত্র, দেবাংশী, আঁধার মহিষ, অন্ধকারের নদী, স্বপ্ন ও অন্যান্য নীলিমা ইত্যাদি উপন্যাসের মধ্যে 'আঁধার মহিষ' উপন্যাসটি হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক আখ্যানের উপর রচিত। আর 'স্বপ্ন ও অন্যান্য নীলিমা' উপন্যাসটিতে নকশালবাড়ি ও পূর্ববঙ্গের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে জটিল বিষয়বস্তু রয়েছে। বাকি উপন্যাসগুলিতে মূল বিষয়বস্তু কৃষি জমি বিষয়ক, কৃষি উৎপাদন সম্পর্ক। একদিকে জোতদার মহাজন অন্যদিকে ভূমিহীন, আধিয়ার, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক মাঝে প্রশাসন, ব্যাঙ্ক ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। দুই বাংলা ভাগ হয়ে যাওয়ার কারণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে লেখকের। বাজিকর গোষ্ঠীর যাযাবর জীবনের অনিশ্চিয়তা, আশঙ্কার বিষাদময় ছবিতে লেখকের অভিজ্ঞতার স্পর্শ। রিফিউজি তো পশ্চিম বাংলার জনসমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল বহুদিন পর্যন্ত। তাদের বাসস্থান ছিল 'কলোনি'। উত্তর বাংলায় বসবাসের সুবাদে গ্রাম সমাজে আর তার মানুষজনের ছবি, ঘাত-প্রতিঘাতের ছবি, প্রশাসন, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বাস্তব ছবি অভিজিতের আখ্যানকে ছাপিয়ে ইতিহাস হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের যে সব লক্ষণগুলির বিদগ্ধ প্রাবন্ধিকরা উত্তর আধুনিকতার লক্ষণ হিসাবে নির্দেশ করেছেন, তা বহুলাংশে প্রতিভাত অভিজিতের উপন্যাসের পরিসরে। বিভিন্ন ভৌগলিক ধারণার স্বীকৃতি, সমাজের দুর্বল মানুষের দুরবস্থা, গ্রাম্য জীবনের ঐতিহ্য, তার লৌকিক দেব-দেবী, মিথ এবং কোথাও কোথাও

সেই যাদুবাস্তব সমস্ত উপাদানই অভিজিতের উপন্যাসে সামঞ্জস্যভাবে নিজস্ব অনুষঙ্গে উপস্থিত। অভিজিৎ তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চার দশকের বেশি সময় ধরে বামপন্থী রাজনীতির দোলাচল, তার মূল্যবোধের অবক্ষয় লক্ষ্য করেছেন। অভিজিৎ সেনের লেখার সত্বময় কালটাকে মহাশ্বেতা দেবীর যুগ বলা হয়। সমসাময়িক অনেক লেখকের উপর মহাশ্বেতা দেবীর তিন দশক ব্যাপী প্রভাব স্বীকার্য। অভিজিৎ সেন নানা নিবন্ধে একথা প্রকাশও করেছেন। অভিজিৎ সেনের পুলিশ আর দারোগারা সর্বত্রই ধর্ষকের ভূমিকায়। এই ধর্ষণ, মূল্যবোধের ধর্ষণ, সম্ভবত নিরস্ত্র মানবিক অস্তিত্বের পক্ষে সবচেয়ে অবমাননাকর। অভিজিৎ সেনের চারণভূমি উত্তরবাংলার বঞ্চিত, শোষিত প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল ও কখনো কখনো মুর্শিদাবাদ ও শহর কলকাতা এসেছে তাঁর রচনায়। আর মহাশ্বেতা দেবীর পরিসর ছোটনাগপুরের মালভূমি-পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ইত্যাদি ভূগোল আলাদা, ভাষা আলাদা, ব্যবহারিক জীবন আলাদা কিন্তু শোষণ, অত্যাচার, লুণ্ঠন, বঞ্চনার পদ্ধতি এবং মাত্রা একই রকম। উত্তরআধুনিক কালের উপন্যাসে অভিজিৎ সেন, শরৎচন্দ্র থেকে মানিক পর্যন্ত আখ্যান ভাগের বয়ানের সার্থক উত্তরাধিকারী। মহাশ্বেতা দেবী কি এই কাঠামো থেকে খুব বেশি বিচ্যুত হয়েছেন। উত্তর আধুনিকতার নিরিখে অভিজিতের উপন্যাসের আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা নিশ্চিতভাবে উত্তর আধুনিক। আর সেই পরিসরে আমাদের চেনা জানা মানুষজন, গ্রামীণ সমাজ, প্রান্তিকতা, অন্তজ নিম্নবর্গী সাধারণ মানুষ সব মিলিয়ে রয়ে গেছে বাংলার উপন্যাসের বিশ শতকের মূল্যবান ঐতিহ্য।

দীর্ঘ দুশো বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে দেশজ পরম্পরার বিপরীতে যে ভিন্ন পরম্পরা গড়ে উঠেছে সমাজে। সেই পরাশ্রয়ী পরম্পরায় আমাদের সম্পূর্ণতা সাধিত হয় নি। ঔপনিবেশিক কালে যে সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে আমরা উত্তর আধুনিক হতে চেয়েছি তা যেমন সার্বিক বিস্তার লাভ করতে

পারেনি তেমনি আমরা ঔপনিবেশিক কালের সংস্কৃতির চরিত্র সম্পর্কে পুরোপুরি অবগতও হতে পারিনি। ঔপনিবেশিক কালে যে শিক্ষাকে আমরা অর্জন করতে সচেষ্ট হয়েছি, সেই শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের মনোজগতে এক বিচ্ছিন্নতারই জন্ম দিয়েছে। শহরে শিক্ষাঅর্জন করে গ্রামে ফিরে গিয়ে গ্রাম্য জীবনে সেই শিক্ষার উপযোগী ব্যবহার ও ক্ষেত্র না পাওয়ায় ব্যর্থ ও নিঃসঙ্গ হতে হয়েছে। উত্তর ঔপনিবেশিক কালের স্রোতে ভাসতে গিয়ে তাকে আত্মস্থ করতে গিয়ে আমরা দেখি আমাদের দেশীয় ঐতিহ্য ও পরম্পরা বিনষ্ঠ ও মৃত প্রায়। কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে মুছে ফেলাও সম্ভব হয়নি। আর অন্যদিকে রয়েছে পরের আশ্রয়ে আশ্রিত এক পরম্পরা, যা দেশেজ পরম্পরার সঙ্গে মিশে এখন হতে পারে নি। তেল জলের মতো আলাদা হয়ে গেছে। অভিজিৎ সেনের বিভিন্ন উপন্যাসে এ পর্যন্ত আমাদের কথা সাহিত্যে যে ধারাবাহিক প্রতিবেদন রচিত হয়েছে তাতে ঔপনিবেশিক প্রভাব অত্যন্ত পরিস্ফুট। প্রাক-উপনিবেশিক কালে আমাদের কথাসাহিত্য রচনার নিজস্ব রীতি পদ্ধতি ছিল। উত্তর উপনিবেশ কালে আধুনিকতার কেন্দ্রভূমিটি প্রতিনিয়ত বিনষ্ট হতে দেখা গিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে, মন্বন্তর, তেভাগা, দেশভাগ, দাঙ্গা ইত্যাদির ফলস্বরূপ অর্থনৈতিক সংকট যেমন তীব্র ছিল তেমনি ষাট ও সত্তর দশকেও আমাদের আশাভঙ্গ হয়েছিল। এই সংকট ও দূরাবস্থার নবপ্রেক্ষাপটে বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের বয়ান রচনার নতুন রূপ পাওয়া গেল। সমকাল অর্থাৎ ষাট-সত্তর-আশি ও নব্বই এর দশককে কেন্দ্র করে মূলত উত্তর ঔপনিবেশিক কালের দেশজ গ্রাম্য-অর্থনীতি, রীতি সংস্কার, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, প্রতিবাদ, বঞ্চনা, ধর্ষণ, রক্ষকই ভক্ষক ইত্যাদি দিকগুলিতে স্পটলাইট ফেলে আমাদের সামনে হাজির করেছেন অভিজিৎ সেন। পাঠকের চোখে আঙুল দিয়ে কখনও প্রতিবেদকের মতো আবার কখনও কথাসাহিত্যিকের মতো আমাদের সামানে অন্যায় ও অনগ্রসরতার দিকগুলিকে তুলে ধরেছেন। শুধুমাত্র রাজনীতি সচেতন লেখকেরাই নন,

তুলনামূলকভাবে সাধারণ প্রকৃতির সস্তা সাহিত্যিকেরাও এই সময়ের গুরুত্বকে বুঝতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাই কথা সাহিত্যের প্রতিবেদনে সম্পৃক্ত হয়ে থাকছে নিম্নবর্গীয় মানুষ। সত্তর-আশির দশকের সমকালীন সময়ে সমাজের প্রান্তিকায়িত জনছবি, উপেক্ষিত ব্যক্তি, পরিবর্তনশীল ও পরিবর্তনে প্রয়াসী জনগণের চিত্র, নিম্নবর্গীয় জনসাধারণের চিত্র অসম্ভব মাত্রায় ফুটে উঠেছে অভিজিৎ সেনের উপন্যাসে। আটের দশকে গ্রাম নির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় নানা হেরফের ঘটে যাচ্ছিল। বিশেষত জোতদার আধিয়ার-ভাগচাষীরা তাদের নিজস্ব জমি, বর্গাজমি, খাসজমি প্রভৃতি দখল রাখতে গিয়ে বিভিন্ন সংগ্রামের মুখোমুখি হচ্ছিল। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার শুভ ও অশুভ দিকগুলিও প্রকাশ পাচ্ছিল।

অভিজিৎ সেনের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ বর্তমান থেকে অতীতে, অতীত থেকে বর্তমানে চলমান থাকে। স্মৃতিতে সচল থাকে নানা অভিজ্ঞতা, ইতিহাস, সামাজিক নানান প্রতিক্রিয়া। তিনি সামন্ততান্ত্রিক জগৎ থেকে ঔপনিবেশিক সামন্ততন্ত্র পেরিয়ে বহুরূপী বামফ্রন্ট সরকারের দূর্নীতিগ্রস্থ, অধঃপতিত পঞ্চায়েত তন্ত্রকে সমানভাবে আলো ফেলে দেখিয়েছেন। ফলে আমরা এমন এক দূর্লভ ঔপন্যাসিকের সন্ধান পেলাম যাঁর কণ্ঠস্বর একক নয় বহুস্বরিক। যিনি সময়ের পরতে পরতে ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে থাকা গ্রাম বাংলার অসুস্থতাকে নির্ণয় করেন এবং অসুস্থতার কারণরূপী ভাইরাস গুলিকে চিনিয়ে দিতে সাহায্য করেন। সত্তরের দশকের উত্তাল আবহাওয়ায় কৃষক, চাষী, বর্গাদার, আধিয়ার ইত্যাদির সংগ্রামের প্রাক্কালে অভিজিৎ সেনের আবির্ভাব। তাঁর চেতনায় সত্তরের দশকের প্রতিবাদী সংঘবদ্ধ কৃষক, শ্রমিক, চাষী, আধিয়ার, বর্গাদার, সাধারণ প্রান্তিক অন্ত্যজ মানুষদের এককথায় নিম্নবর্গীয়দের কাহনের অনুসন্ধিৎসা ও অন্বেষণ লক্ষণীয় বিষয়। ইতিমধ্যে গ্রাম-বাংলা ও নগরবাংলার মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সুযোগ সন্ধানী মধ্যবিত্তরা একে একে তাদের পাপড়ি উন্মোচন করতে শুরু করেছে। এমন দুঃসময়ে

অভিজিৎ সেনের একটির পর একটি উপন্যাস পাঠকবর্গকে ধাক্কা দিল। তাদের চৈতন্যে আঘাত করে তাদেরকে ভাবতে বাধ্য করেছে অভিজিৎ সেনের উপন্যাস। কারণ তাঁর উপন্যাসে তৎকালীন সময় এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তথ্যের আকারে প্রতিবেদনের মাফিক বর্ণনা করা হয় যে তা যে কোনও পাঠককে ভাবিয়ে তুলতে সক্ষম। তাঁর উপন্যাসে যে স্থানের কথা, যে মানুষদের কথা উঠে এসেছে তাদেরকে কি আজ আমরা মনে রেখেছি? খবরের কাগজ বা ভূগোল পড়ে নতুন করে কি তাদের মাঝখানে ফিরে যাওয়া যাবে? তাদের দুঃখে, অবর্ণনীয় দুর্দশায়, দুরবস্থায় কি সামিল হওয়া যাবে? মুখোমুখি হওয়া যাবে কি সেই বাস্তবের? ইত্যাদি নানান প্রশ্ন ছুড়ে দেন লেখক বর্তমান পাঠকদের উদ্দেশ্যে। সময় কিন্তু নিজের তালে ঘুরেই চলেছে।

> *"অভিজিৎ সেন ধরে রেখেছেন এই সময়কে। তার উপন্যাস সময়ের দলিল। তাই তিনি এই সময়ের প্রধান কথাকোবিদ। তাঁর উপন্যাস আমাদের শীতার্থ চেতনায় নিয়ে আসে সৌর উত্তাপ সমাজতাত্ত্বিকের মতোই তিনি তুলে আনেন তাঁর বিষয়কে, আর উপন্যাস শিল্পীর মতোই তার নির্মাণকে করে তোলেন যথাযথ। বস্তুতঃ অভিজিৎ সেনের হাতে উপন্যাস এক নতুন গঠনভঙ্গি লাভ করে। গতানুগতিকতা থেকে, প্রথা থেকে বেরিয়ে আসে এবং স্বকীয়তায় আত্মপরিচয় দেয় তাঁর এক একটি নির্মাণ।"* [১৭]

অভিজিৎ সেন তাঁর সময়ের অর্থাৎ ষাট-সত্তর আশি-নব্বইয়ের রচনায় নতুন গঠনভঙ্গি ও আঙ্গিকের ব্যবহার করেছেন যা তাকে স্বতন্ত্র্য ঔপন্যাসিকের

আখ্যা দিয়েছে। তিনি একাধারে যেমন ঔপন্যাসিকের মতো শিল্প সৃষ্টি করেছেন সাহিত্যের উদ্দেশ্যে। বাংলা সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য অন্যধারে তেমনি তিনি একজন প্রতিবেদকের মতো প্রতিবেদন শুনিয়েছেন। প্রতিবেদনে তিনি তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন সাহিত্যের ভঙ্গিতে। এখানেই তাঁর নিজস্বতা। একদিকে প্রতিবেদনের মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতি ও অন্যদিকে ঔপন্যাসিকের শিল্পসৃষ্টি উভয় মিলে অভিজিৎ সেনকে সমকালীন সময়ের অন্যতম প্রধান ঔপন্যাসিকের মর্যদায় ভূষিত করায় যায়। বাংলা সাহিত্যে এরকম দৃষ্টান্ত বিরল।

তথ্যসূত্র :

১. 'কি লিখি— কেন লিখি', কোরক, শারদীয় ১৩৯৭

২. 'উপন্যাস ভাবনা', অভিজিৎ সেন, এবং মুশায়েরা, অক্টোবর-৯৬ - মার্চ-৯৭, **Vol No-** ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ৪৮-৪৯

৩. 'রহুচণ্ডালের হাড়', অভিজিৎ সেন, জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১০, পৃঃ ০৫

৪. তদেব, পৃঃ ২০৮

৫. তদেব, পৃঃ ২৪৩

৬. তদেব, পৃঃ ৪৫

৭. তদেব, পৃঃ ৩২

৮. 'দেবাংশী ও অন্যান্য গল্প', অভিজিৎ সেন, প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ- ১৫ই এপ্রিল- ২০১১, পৃষ্ঠা- ১৯

৯. তদেব, পৃঃ ২৬

১০. 'বর্গক্ষেত্র', অভিজিৎ সেন, স্বস্তিক প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, মহালয়া, ২০১৩, পৃঃ ১৮

১১. তদেব, পৃঃ ৩৫

১২. 'স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা', অভিজিৎ সেন, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০০০, পৃঃ ৬৭

১৩. তদেব, পৃঃ ৪৪

১৪. তদেব, পৃঃ ৬১

১৫. তদেব, পৃঃ ১১৬

১৬. তদেব, পৃঃ ১৪৮

১৭. 'অন্ধকারের নদী : নোনা আর ঘূণের গল্প', অলোক রঞ্জন চক্রবর্তী, জনপদপ্রয়াস, ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০০০, পৃঃ ৯৩